Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের আজাব ও আমাদের প্রস্তুতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া বাসরী

রোলঃ 23100120423

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কবরের আজাব ও আমাদের প্রস্তুতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাবেয়া বাসরী

রোলঃ 23100120423

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " কবরের আজাব ও আমাদের প্রস্তুতি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাবেয়া বাসরী, আইডিঃ 23100120423 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কবরের আজাব ও আমাদের প্রস্তুতি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাবেয়া বাসরী

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

রাবেয়া বাসরী

আইডিঃ 23100120423

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য,পদ্ধতি 7

**মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য 9

**পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও দুনিয়ার মোহ 13

**পার্থিব জীবনের নশ্বরতা ও আল্লাহর উপমা 14

**মানুষের বয়সের পরিক্রমা ও বার্ধক্যের বাস্তবতা 15

**জান্নাতের মর্যাদা বনাম দুনিয়ার তুচ্ছতা 15

**জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতা ও দরিদ্র সাহাবীদের আক্ষেপ: 16

**দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচার এবং আখেরাতমুখী হওয়ার উপায় 17

** আলেমে বারযাখ ও এর ভয়াবহতা 20

**কবরের সংজ্ঞাঃ 21

**কবর জীবন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণী ও নির্দেশনা: 22

**দাফনবিহীন মৃতব্যক্তির বারযাখ ও আজাবঃ 24

**কবরে আজাব থেকে বাঁচার জন্য এক ব্যাক্তির আগুনে ছাই এর ঘটনাঃ 25

কবরের সংকীর্ণতা ও প্রথম চাপ: 27

কবরের আজাবের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (স্থায়ী বনাম সাময়িক আজাব): 33

প্রস্রাবের পর পবিত্রতা অর্জনে অসতর্কতা থাকার কারনে 39

আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে তা আমল না করা এবং ফরজ সালাতে অলসতার কারনে কবরের আজাব 41

মিথ্যাচার এবং অপপ্রচার (মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া): 41

ব্যভিচার (যিনা) এবং অনৈতিক সম্পর্ক এর কারনে কবরের আজাব 42

সুদ খাওয়া ও সুদী কারবারের সাথে জড়িত থাকার কারনে কবরের আজাব 42

এক নজরে কবরের আজাব হতে মুক্তি এবং পরকালীন প্রস্তুতির বাস্তব রূপরেখা 43

উপসংহারঃ.....44

ভূমিকা

দুনিয়াতে আসার নাম জন্ম, আর চলে যাওয়ার নাম মৃত্যু। অর্থাৎ সৃষ্টিজগতের প্রতিটি প্রাণীর জন্য মৃত্যু একটি অনিবার্য সত্য। সহজভাবে বললে, যার প্রাণ আছে তার মৃত্যু একদিন হবেই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ" — - *(প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে)* (সূরা আলে ইমরান: ১৮৫)।

মৃত্যু, কবরের আজাব, এই শব্দ শুনলেই আমরা কেমন যেন এড়িয়ে চলতে চাই। এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হলে আমরা বেখেয়াল হয়ে যাই, আমাদের নফস যেন পালিয়ে যেতে চায়। অথচ আমাদের চোখের সামনেই কত মানুষ প্রতিনিয়ত কবরে চলে যাচ্ছে। এত বড় দুনিয়া, এই বিশাল বিস্তৃত জমিনে একটি মানুষের শেষ ঠিকানা হয় মাত্র সাড়ে তিন হাত মাটির সেই ছোট্ট কবর। সেটাই হয় তার আপন স্থায়ী ঘর। সেখানে ধনী-গরিব সবাই সমান। অভাবী মানুষের জন্য যেমন সাড়ে তিন হাত জায়গা, ধনীর জন্যও ঠিক ততটুকুই। কবর কোন ব্যক্তি ধনী কোন ব্যক্তি অভাবী তা দেখে না কবর শুধু কোন ব্যক্তি নেককার আর কোন ব্যক্তি বদকার তা চিনে, যে যেমন কর্ম (আমল) নিয়ে যায় তাকে তেমন প্রতিদান প্রদান করা হয়।

এই চিরন্তন বাস্তবতা আমরা দেখেও যেন না দেখার ভান করি। কেন জানি আমাদের মন এসব আজাবের কথা শুনতে চায় না, কেবল শুধু সুখ আর নেয়ামতের কথাই শুনতে ভালোবাসে। আমরা কবরের আজাবকে ভয় পাই, কিন্তু সেই আজাব থেকে বাঁচার চেষ্টা করি না, সতর্কও হতে চাই না। অথচ সময় আমাদেরও শেষ হয়ে আসছে। খুব শিগগিরই আপনাকে, আমাকেও চলে যেতে হবে সেই অন্ধকার সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে। কিন্তু আমরা যেন এই সত্য জেনেও অজানা হয়ে দুনিয়ার এই ভোগবিলাসে ডুবে আছি।

আমাদের এই দুনিয়ার জীবন খুবই অল্প সময়ের একটি পরীক্ষার হল মাএ। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝের সময়টুকুই হলো আমাদের প্রস্তুতির সময়। এই সময়টাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলেই সফলতা, আর অবহেলা করলে শেষ পরিণতি হবে ভয়াবহ।

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীরের (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইসলামী স্কলারদের মতে, "বারযাখ হলো মৃত্যু থেকে কেয়ামত (পুনরুত্থান) পর্যন্ত সময়ের মধ্যবর্তী জগত বা আড়াল। এটি দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্যবর্তী একটি অন্তরাল, যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর অবস্থান করে এবং কবরের জীবনের সওয়াল-জওয়াব ও শাস্তি বা শান্তি ভোগ করে"

প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য,পদ্ধতি

কবরের আজাব ও আমাদের প্রস্তুতি

১. গবেষণার প্রেক্ষাপট:

ইসলামি জীবন আদর্শে পরকাল ও কবরের জীবনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের একটি অংশ। "(সূরা শু রা, আয়াত: ২০)। এই আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী আলেমগণ দুনিয়াকে 'আখিরাতের শস্যক্ষেত্র' হিসেবে অভিহিত করেছেন। যেখানে প্রতিটি মানুষকে তার আমলের হিসাব দিতে হবে। তবে বর্তমান আধুনিক সভ্যতায় বস্তুগত উন্নতির সাথে সাথে মানুষের মধ্যে পরকালবিমুখতা এবং কবরের ভয়াবহ আজাব সম্পর্কে এক ধরণের চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

মানুষ আজ দুনিয়াবি ক্যারিয়ার গড়তে যতটা সময় ও শ্রম ব্যয় করছে, তার একভাগও কবরের জীবনের প্রস্তুতির জন্য দিচ্ছে না। প্রযুক্তির ভুলব্যবহার এবং বিনোদনের প্রাচুর্য মানুষকে মৃত্যুর কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বাড়ছে এবং আখিরাতে জবাবদিহিতার ভয় মানুষের মন থেকে উঠে যাচ্ছে। অথচ মৃত্যুর মাধ্যমে যে বারযাখ বা কবরের জীবনের সূচনা হবে, সেখানে আমল ছাড়া আর কোনো সহায় থাকবে না।

এই প্রেক্ষাপটেই বর্তমান মুসলিম সমাজকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে মৃত্যুর পরবর্তী বাস্তবতা স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং কবরের আজাবের ভয়ংকর রূপ সম্পর্কে সতর্ক করা প্রয়োজন। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দলিলভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে কবরের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের আবশ্যকতা তুলে ধরাই এই গবেষণার প্রধান ভিত্তি।

২. গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

একজন সচেতন মানুষের মৌলিক কাজ হলো কোন জিনিস তার জন্য কল্যাণকর এবং কোন জিনিস ক্ষতিকর তা সঠিকভাবে নির্ণয় করে সেই অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। দুনিয়াবি জীবনে সফলতা অর্জনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা এবং সে অনুযায়ী চেষ্টা করা আমাদের জন্য যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক আখিরাতের জীবনের সফলতা অর্জনের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা তার থেকে আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী মানুষের জীবনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি।মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি সৃষ্টির পেছনে বিশেষ হিকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে।তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো মানুষ, যাকে "আশরাফুল মাখলুকাত" হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য কুরআন ও হাদিস প্রদান করেছেন, যাতে মানুষ তার জীবনের লক্ষ্য ও গন্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে। এই পথ অনুসরণ করলে মানুষ সফলতার দিকে অগ্রসর হয়, আর তা থেকে বিমুখ হলে বিপথগামিতা দেখা দেয়।

এই প্রেক্ষাপটে, এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে কবরের জীবন ও কবরের আজাব সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করা। পাশাপাশি কবরের আজাবের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা এবং তা থেকে মুক্তির উপায় সংক্ষেপে তুলে ধরা। এছাড়া মানুষের মধ্যে পরকাল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করাও এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য।

৩. গবেষণা পদ্ধতিঃ (Methodology)

এই থিসিসটি সম্পন্ন করতে 'বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক' পদ্ধতি অনুসরণ 6করা হয়েছে। তথ্যের উৎস হিসেবে মূলধারার নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষ করে:

- কুরআন ও তাফসীর: আল-কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াত ও তার নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা।
- হাদীস গ্রন্থ: সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ সিহাহ সিত্তাহর হাদীসসমূহ।
- মনীষীদের গবেষণা: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর 'কিতাবুর রূহ', ইমাম সুয়ূতী (রহ.)-এর 'শরহুস সুদূর' এবং ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহ.)-এর 'ইসলামী আকীদা' ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ।

**মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা জিন ও মানবজাতি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন, (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) *"আমি জিন ও মানুষকে আমার ইবাদত, করার জন্যই সৃষ্টি করেছি"* (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬)। এই আয়াতে ইবাদত বলতে আল্লাহর একত্ববাদ, আনুগত্য এবং তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন পরিচালনা করাকে বোঝানো হয়েছে

ইবাদত আসলে কি? ইবাদত কি শুধু নামায, রোজা আর তাসবিহ কে বুঝায়?

সাধারণত ‘ইবাদত’ শব্দটা বলতে আমারা সালাত পড়া, রোজা রাখা, হজ্ব করা অথবা কোরআন তিলাওাত করা এগুলোই বুঝি। হ্যাঁ এগুলো অবশই ইবাদত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা কোনভাবেই বাদ দেয়ার সুজুগ নেই। তবে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবেবস্থা, একজন মুমিন যখন তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী করে, তখন তার ঘুম, আহার, এমনকি উপার্জনও ইবাদত হিসেবে গণ্য হয়।

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"

বল, আমার নামায, আমার যাবতীয় 'ইবাদাত, আমার জীবন, আমার মরণ (সব কিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই (নিবেদিত)।

(সূরা আন'আম:আয়াত:১৬২)।

এখানে আল্লাহ কেবল নামাজের কথা বলেননি, বরং জীবন ও মরণের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর জন্য নিবেদিত করতে বলেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের প্রতিটি চব্বিশ ঘণ্টা যদি আমরা কেবল অভ্যাসবশত (আদাত) কাটিয়ে দেই, তবে কিয়ামতের দিন এর হিসাব দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

ইমাম গাজালী (রহ.) তাঁর **'এহয়াউ উলুমিদ্দীন'** কিতাবে বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছেন তিনি বলেছেন মানুষের কাজ দুই প্রকার:

১.আদাত (অভ্যাস): যেমন খাওয়া, ঘুমানো বা ব্যবসা করা।
২.ইবাদত: যেমন নামাজ বা রোজা।

তিনি বলেন, ''যদি কোনো ব্যক্তি তার 'আদাত' বা অভ্যাসগত কাজগুলো আল্লাহর হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে এবং নবীজির (সা.) সুন্নাহ মেনে করে, তবে তার সেই 'আদাত' বা অভ্যাসগত 'ইবাদতে' পরিণত হয়''।

বাস্তব জীবনের উদাহরণ:

আদাত বা অভ্যাস হলো সেই কাজগুলো, যা আমরা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রতিনিয়ত করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ: গ্রামের একজন কৃষক চাচা ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে জমিতে ধান লাগানো বা অন্য কোনো চাষাবাদের কাজে মাঠে যান। সেখানে তিনি হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটেন। এটি তাঁর আদত বা অভ্যাস; কারণ প্রতিদিন তিনি এভাবেই কাজ করেন। কিন্তু যখন এই কাজের পেছনে তাঁর কোনো মহৎ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে না, যখন তিনি কেবল এটা মনে করেন যে, যেহেতু তিনি

একজন পুরুষ, তাই নিজের ও পরিবারের আহার সংগ্রহের জন্য তাঁকে এই কাজ করতে হবে।

যদি বিষয়টি কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তাঁর এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলা হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরকালীন কোনো মূল্য রইল না। কারণ, তিনি এর বিনিময়ে আল্লাহর কাছ থেকে সওয়াব লাভের আশা করেননি। তিনি ভেবেছেন, এটি তাকে করতে হবে, তাই করছেন; ব্যস এটুকুই! যদিও আল্লাহ তাআলা পুরুষকে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানের আহার যোগানোর দায়িত্ব দিয়েছেন, কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের পদ্ধতিটি কেবল যান্ত্রিক হওয়া উচিত নয়।
সাধারণত আমরা বা সেই কৃষক মনে করেন, কেবল পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আর কিছু জিকির-আজকার করাই ইবাদত। মানে আল্লাহ এই ৫ টা সময়ই আমাদের ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করেছেন! কিন্তু এটি আমাদের একটি ভুল ধারণা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি কাজ এবং প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর ইবাদতে কাটানো সম্ভব। আমরা কি কেবল এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েই জান্নাতে চলে যেতে পারব? সারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব কি আল্লাহ নেবেন না? অবশ্যই নেবেন।
আমরা চাইলেই পারি আমাদের প্রতিটি কাজকে ইবাদতে রূপান্তর করতে। যেমন—সেই কৃষক চাচার কথাই ধরি। তিনি যদি ভোরে উঠে সালাত আদায় করে এই নিয়ত করেন যে, "আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হালাল উপায়ে রিজিক অন্বেষণের জন্য বের হলাম"—তাহলে তাঁর বাড়ি থেকে মাঠ পর্যন্ত যাওয়া এবং মাঠে কাজ করা, এই পুরোটা সময় তাঁর আমলনামায় ইবাদত হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে। সুবহানাল্লাহ!

অতপরঃ একজন ব্যবসায়ী, যিনি বাজারে বা দোকানে ব্যবসা করছেন, তিনি যদি তাঁর নিয়ত ঠিক রেখে ওজনে কম না দেন, মানুষের সাথে প্রতারণা না করেন, আর এটা মনে রাখেন যে, “আল্লাহ তাকে সততার সাথে ব্যবসা করতে বলেছেন”--- তাহলে তাঁর ওই দোকানে বসে থাকাটাও ইবাদত।

ঠিক তেমনি আমাদের মা-বোনেরা যখন সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কোন বিনিময় ছাড়া পরম স্নেহে পরিবারের সেবা করেন, রান্না-বান্না সন্তানকে লালন-পালন ইত্যাদি

করেন– তখন তাঁরা যদি মনে এই নিয়ত রাখেন যে "আমি আদেশে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই এই দায়িত্ব পালন করছি" তখন তাদের সেই পুর সময়টাও ইবাদত হিসেবে লিপিবদ্ধ হবে।

এই এই কাজ টা কি খুব বেশি কষ্টের ছিলো তাঁর জন্য? মোটেই না, তিনি শুধু তাঁর নিয়ত টা ঠিক রেখেছেন, আর এর বিনিময় মহান আল্লাহ তাঁর পুর কাজটাই ইবাদতে রুপান্তর করে দিলেন। সুবহানাল্লাহ!
এভাবে প্রত্যেক পেশার মানুষেরা তাদের নিয়র ঠিক রেখে তাদের কাজকে ইবাদতে পরিপূর্ণ করতে পারে, এর জন্য আমাদের হারাম থেকে বেচে থাকতে হবে আর সৎ নিয়ত রাখতে হবে।

উপসংহার: তাহলে একটু ভেবে দেখুন তো! আল্লাহ আমাদের জন্য জীবনটাকে কতটা সহজ আর সুন্দর করে দিয়েছেন। আমরা আমাদের প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলোই করব, চাষাবাদ করবো, ব্যবসা করবো, চাকরি, পড়াশোনা করব, শুধু নিয়তটা ক রাখার কারনে আর হারাম থেকে বেচে থাকার কারনে আমাদের এই পুরো ২৪ ঘন্টার জীবনটাই একটা চমৎকার ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে।

আর যখন আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটা সময় প্রতিটা কাজকে এভাবে ইবাদত বানিয়ে ফেলতে পারবো, তখন আমাদের ভেতরের ওই একঘেয়েমি বা অস্থিরতা আর থাকবে না। পরকালের জন্যও আমাদের প্রস্তুতি হয়ে যাবে, তখন জীবনে একটা দারুণ গতি আসবে।

**পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব ও দুনিয়ার মোহ

আমরা যখন একটি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করি, তখন সেই স্টেশনের বেঞ্চ বা প্লাটফর্মকে কি নিজে ঘর মনে করি? অবশ্যই না। কারন আমরা জানি, কিছুক্ষণ পর ট্রেন আসবে এবং আমাদের গন্তব্যে চলে যেতে হবে। ঠিক এই দুনিয়াটা হলো ওই স্টেশেন টার মতো ক্ষণস্থায়ী। যেখানে কিছু সময় আমরা আছি, কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমরা এই দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে একেই নিজের আসল ঠিকানা ভেবে বসে আছি। এটাই হলো দুনিয়ার মোহ বা মায়া।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এই মোহ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন:

তোমরা জেনে রেখ, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, শোভা-সৌন্দর্য, পারস্পরিক গর্ব-অহঙ্কার আর ধন-মাল ও সন্তানাদিতে আধিক্যের প্রতিযোগিতা মাত্র। তার উদাহরণ হল বৃষ্টি, আর তা হতে উৎপন্ন শষ্যাদি কৃষকের মনকে আনন্দে ভরে দেয়, তারপর তা পেকে যায়, তখন তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, পরে তা খড় ভুষি হয়ে যায়। (আর আখেরাতের চিত্র অন্যরকম, পাপাচারীদের জন্য), আখেরাতে আছে কঠিন শাস্তি, (আর নেককারদের জন্য আছে) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোঁকার বস্তু ছাড়া আর কিছুই না। ***(সূরা আল-হাদীদ: ২০)***

এ সূরার **২০-২১ নং আয়াতের তাফসীর: ''**আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, দুনিয়ার সবকিছুই অতি ঘৃণ্য, তুচ্ছ ও নগণ্য। এখানে দুনিয়াবাসীর জন্যে রয়েছে শুধুমাত্র ক্রীড়া-কৌতুক, শান-শওকত, পারস্পরিক গর্ব ও অহংকার এবং ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ(আরবী) অর্থাৎ "নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণ রৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট মনোরম করা হয়েছে। এই সব ইহজীবনের ভোগ্যবস্তু। আর আল্লাহ, তাঁর নিকট উত্তম আশ্রয়স্থল।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর), সূরা আল-হাদীদ (৫৭), আয়াত: ২০-২১।

**পার্থিব জীবনের নশ্বরতা ও আল্লাহর উপমা

''পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে যে, এর শ্যামল-সজীবতা ধ্বংসশীল, এখানকার নিয়ামতরাশি নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী। (আরবী) বলা হয় ঐ বৃষ্টিকে যা মানুষের নৈরাশ্যের পর বর্ষিত হয়।
যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ (আরবী) অর্থাৎ তিনিই আল্লাহ যিনি মানুষের নৈরাশ্যের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে থাকেন। সুতরাং যেমন বৃষ্টির কারণে যমীনে শস্য উৎপাদিত হয়, ক্ষেতের শস্য আন্দোলিত হতে থাকে এবং কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অনুরূপভাবে দুনিয়াবাসী দুনিয়ার মাল-ধন, পণ্যদ্রব্য এবং মূল্যবান সামগ্রী লাভ করে অহংকারে ফুলে ওঠে। কিন্তু পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, ক্ষেতের ঐ সবুজ-শ্যামল ও নয়ন তৃপ্তিকর শস্য শুকিয়ে যায় এবং শেষে খড় কুটায় পরিণত হয়। ঠিক তদ্রুপ দুনিয়ার সজীবতা ও চাকচিক্য এবং ভোগ্যবস্তু সবই একদিন মাটির সাথে মিশে যাবে। ''(তাফসীর ইবনে কাসির)

(৩০:৫৪)। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দুনিয়ার অস্থায়ীত্ব ও নশ্বরতার বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আখিরাতের দু'টি দৃশ্য প্রদর্শন করে একটি হতে ভয় দেখাচ্ছেন ও অপরটির প্রতি উৎসাহিত করছেন। তিনি বলেনঃ সত্বরই কিয়ামত সংঘটিত হতে যাচ্ছে এবং ওটা নিজের সাথে নিয়ে আসছে আল্লাহর আযাব ও শাস্তি এবং তার ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। সুতরাং তোমরা এমন কাজ কর যদদ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে বাঁচতে পার এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পার, রক্ষা পেতে পার তার শাস্তি হতে এবং হকদার হতে পার তার ক্ষমার! দুনিয়া তো শুধু প্রতারণার বেড়া। যে এর প্রতি আকৃষ্ট হয় তার অবস্থা এমনই হয় যে, এই দুনিয়া ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি সে খেয়ালই করে না। দিনরাত্রি ওরই চিন্তাতেই। সে ডুবে থাকে। এই নশ্বর ও ধ্বংসশীল জগতকে সে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থাও তার দাঁড়িয়ে যায় যে, সে আখিরাতকে অস্বীকার করে বসে।

**মানুষের বয়সের পরিক্রমা ও বার্ধক্যের বাস্তবতা

দুনিয়ার জীবনও সেই শস্যক্ষেত এর মতো। প্রথমে আসে যৌবন, এর পরে অর্ধবয়স এবং শেষে বার্ধক্যে উপনীত হয়। স্বয়ং মানুষের অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। তার শৈশব, কৈশর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব এবং বার্ধক্য, এসব অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিস্মিত হতে হয়! কোথায় সেই যৌবনাবস্থার রক্তের গরম এবং শক্তির দাপট, আর কোথায় বার্ধক্যাবস্থার দুর্বলতা, কোমরের বক্রতা ও অস্থির শক্তিহীনতা!

যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেনঃ (আরবী)অর্থাৎ "আল্লাহ তিনিই যিনি তোমাদেরকে দুর্বলতার অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, তারপর ঐ দুর্বলতার পরে শক্তি দান করেছেন, আবার ঐ শক্তির পর দিয়েছেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য, তিনি যা চান সৃষ্টি করে থাকেন, তিনি সর্বজ্ঞ ও ক্ষমতাবান।"

**জান্নাতের মর্যাদা বনাম দুনিয়ার তুচ্ছতা

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "জান্নাতে একটি চাবুক রাখার জায়গা দুনিয়া ও ওর মধ্যে যা কিছু আছে তার সব থেকে উত্তম। তোমরা পাঠ করঃ (আরবী) অর্থাৎ "পার্থিব জীবন ছলনার ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আয়াতটির উল্লেখ ছাড়া হাদীসটি সহীহ গ্রন্থেও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন)

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ "তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে জান্নাত জুতার তাসমার (চামড়ার লম্বা অংশের) চেয়েও বেশী নিকটবর্তী, জাহান্নামও অনুরূপ।" (ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম বুখারী (রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন) সুতরাং জানা যাচ্ছে যে, ভাল ও মন্দ মানুষের খুবই নিকটে রয়েছে। তাই মানুষের উচিত মঙ্গলের দিকে অগ্রণী হওয়া এবং মন্দ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যাতে পাপ ও অন্যায় মাফ হয়ে যায় এবং পুণ্য ও মর্যাদা উঁচু হয়। এ জন্যেই এর পরপরই আল্লাহ পাক বলেনঃ তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের

প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের প্রয়াসে যা প্রশস্ততায় আকাশ ও পৃথিবীর মত।

**জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতা ও দরিদ্র সাহাবীদের আক্ষেপ:

অন্য জায়গায় রয়েছেঃ (আরবী) অর্থাৎ "তোমরা দৌড়িয়ে যাও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং এমন জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা হলো আকাশ ও পৃথিবী (তুল্য) যা তৈরী করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে।" (৩:১৩৩)এ লোকগুলো আল্লাহ তা'আলার এই অনুগ্রহ লাভের যোগ্য ছিল। এ জন্যেই পরম করুণাময় আল্লাহ এদের প্রতি তাঁর পূর্ণ অনুগ্রহ দান করেছেন।পূর্বে একটি বিশুদ্ধ হাদীস গত হয়েছে যে, একবার মুহাজিরদের মধ্য হতে দরিদ্র লোকেরা আরয করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সম্পদশালী লোকেরা তো জান্নাতের উচ্চশ্রেণী ও চিরস্থায়ী নিয়ামত রাশির অধিকারী হয়ে গেলেন! রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রশ্ন করলেনঃ "এটা কিরূপে?" উত্তরে তারা বললেনঃ "নামায, রোযা তো তারা ও আমরা সবাই করি। কিন্তু মাল-ধনের কারণে তারা দান খায়রাত ও গোলাম আযাদ করে থাকেন। কিন্তু আমরা দারিদ্রের কারণে এ কাজ করতে পারি না।" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বললেনঃ "এসো, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কাজের কথা বলে দিচ্ছি, যদি তোমরা তা কর তবে তোমরা সবারই আগে বেড়ে যাবে। তবে তাদের উপর তোমরা প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না যারা নিজেরাও এ কাজ করতে শুরু করে দিবে। তাহলে এই যে, তোমরা প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার এবং তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করবে।" কিছুদিন পর ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের এই অযীফার খবর আমাদের ধনী ভাইয়েরাও পেয়ে গেছেন এবং তাঁরাও এটা পড়তে শুরু করেছেন!" তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ "এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি এটা দান করেন।"

তথ্যসূত্র: ইবনে কাসীর, হাফিয ইমাদউদ্দীন। তাফসীরুল কুরআনিল আজীম (তাফসীরে ইবনে কাসীর), (তাফসীরে ইবনে কাসীর), সূরা আল-হাদীদ (৫৭),

আয়াত: ২০-২১।

**দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচার এবং আখেরাতমুখী হওয়ার উপায়

ইবনে কাসির (রহ.)- এর তাফসীর থেকে আমরা জানতে যে, দুনিয়েটা একটা ধোঁকার জায়গা ছাড়া কিছুই না, এর মোহ মানুষকে অন্ধ করে দেয়, ধীরে ধীরে মানুষকে আখিরাতবিমুখি করে তোলে, আমরাও এতে ডুবে থাকি, আনন্দ উল্লাসে মেতে থাকি, সত্য কথা হচ্ছে আমরা তখন এর ভয়াবহতা না বুজলেও এটা আমরা আমাদের জীবনের শেষ পর্যায় এসে ঠিকই বুঝতে পারি, তবে আফসোস এর বিসয় হলো তখন আর নিজের ভুল গুলো শুধরানোর সময় থাকে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা তো এই দুনিয়াতেই বসবাস করছি, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে, তাহলে এর ক্ষতিকর মোহ থেকে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে বাঁচাব? প্রথমেই বলে রাখি, ইসলাম আমাদের দুনিয়া ত্যাগ করে বৈরাগী হতে বলেনি, বরং দুনিয়াতে থেকে এর বাস্তবতা মেনে, দুনিয়ার নিয়ম কানুন মেনেই পরকালের প্রস্তুতি নেওয়ার কিছু উপায় শিখিয়েছেঃ

১. বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা:
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "তোমরা জীবনের স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।" (সুনানে তিরমিজি)।

দুনিয়ার মায়া কাটানোর সবচেয়ে বড় ওষুধ হলো মৃত্যুকে স্মরণ করা। বেশি না প্রতিদিন অন্তত একবার যখন আমরা মৃত্যুকে স্মরণ করবো যে–আজ আমি সারা দিন কতো গুনাহ করেছি, কতো আদেশ অমান্য করেছি, মানুষের মনে কষ্ট দিয়েছি আমি যদি এখন মারা যাই, আমার শ্বাস যদি এখন থেমে যায় আমি কি করবো আমি তোঁ তাওবা করতে পারলাম না, যে মানুষটার মনে আঘাত দিয়েছি তাঁর কাছে মাফ চাইতে পারলাম না, তাহলে আমার পরিণতি কি হবে আমি কিসের বাহানা দিয়ে বাঁচব, আল্লাহ তো আমাকে আগেই সতর্ক করেছেন, আজ যে বিছানায় আমি ঘুমাচ্ছি, কাল হয়তো এই আরাম দায়ক বিছানা আমার থাকবে না কেউ আমাকে সেখানে

ঘুমাতে দিবে না, আমাকে মাটির বিছানায় শুতে হবে, এই সব নিয়ে যখন আপনি ভাববেন, তখন দুনিয়ার এই মোহ এর প্রতি ভালোবাসা এক নিমিষেই শেষ হয়ে যাবে।

২. দুনিয়াবি সুখ, সম্পদের বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্নপর্যায়ের মানুষের দিকে তাকানো:
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:
"তোমাদের চেয়ে আর্থিক ও শারীরিক দিক দিয়ে যারা নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে, তোমরা তাদের দিকে তাকাও। তাহলে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর যে নিয়ামত রয়েছে, তা তুচ্ছ মনে হবে না (বরং তোমরা তার শোকর আদায় করতে পারবে)।" *(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)*

আমাদের সব থেকে বড় অস্থিরতার কারন হচ্ছে এটা, আমরা সব সময় আমার থেকে কে বেশি ভালো আছে সেটা লক্ষ্য করে আফসোস করি, তাঁর একটা গাড়ি আছে, আর আমার কাছে মাত্র একটা সাইকেল, আপনি উপরে না তাকিয়ে আপনার নিচের মানুষের দিকে তাকান যার কাছে সেই সাইকেল টাও নেই সে পায়ে হেটে যাচ্ছে, সুতরাং আমি তাঁর থেকে ভালো আছি, তেমনি যিনি নিজ পায়ে হাটতে পারছেন তিনি তাঁর নিচের লোকের দিয়ে দেখুন আমার তো পা আছে ওই লোক টার তো একটি পা নেই সুতরাং আমি তাঁর থেকে ভালো আছি, যার একটি পা নেই সে তাঁর নিচের মানুষের দিকে তাকান যার ২ পাই নেই, আপনি এক পায়ে ভর দিয়ে লাঠি দিয়ে হাটতে পারছেন সেই লোক টা সেটাও পারছে না সুতরাং আমি তাঁর থেকে ভালো আছেন, এভাবে ভাবতে পারলে আমাদের জীবনে কোন না পাওয়ার আফসোস থাকবে না, দুনিয়ার লোভ আপনারা বস করতে পারবে না, এবং সহজেই জান্নাত লাভ করতে পারবেন, কারন যার ধনসম্পদ বেশি কেয়ামতের দিন তাঁর হিসাব ও বেশি।

৩. প্রতিটি কাজের শুরুতে নিয়ত খতিয়ে দেখা:
আমিরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছি: (إِنَّمَا

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) অর্থ: *"নিশ্চয়ই সমস্ত কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর প্রতিটি মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ীই প্রতিফল পাবে।"*
আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই পড়েছি যে, নিয়ত ঠিক রাখলে দুনিয়ায় আমাদের আদাত বা অভ্যাসগত কাজগুলোও ইবাদত হয়ে যায়। তাই প্রতিনিয়ত নিজের নিয়তকে চেক করতে হবে। চাকরি, ব্যবসা বা পড়াশোনা—সবকিছুর পেছনে মূল উদ্দেশ্য হতে হবে হালাল উপার্জন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।

"পরিশেষে বলা যায়, মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দাসত্ব করা, আর এই দুনিয়া হলো পরীক্ষার একটি ক্ষণস্থায়ী হল মাত্র। শীতে মৌসুমে যখন গাছ শুকিয়ে একটি একটি করে পাতা ঝরে যায় তেমনি একটু একটু আমাদের জীবনের মূল্যবান সময়ও ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহ কাটিয়ে যারা নিজেদের পরকালের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে, তারাই সফল। আর পরকালের সেই অনন্ত যাত্রার প্রথম ধাপটি হলো 'কবর' বা বারযাখ। দুনিয়ার মোহ থেকে চোখ ফিরিয়ে এখন আমাদের তাকাতে হবে সেই অন্ধকার ঘরের দিকে, যেখানে আমাদের একাকী থাকতে হবে। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেই কবরের জীবনের বাস্তবতা এবং এর ভয়াবহ আজাবসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।"

** আলেমে বারযাখ ও এর ভয়াবহতা

ইসলামি পরিভাষায়, মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের আত্মা যে অন্তর্বর্তীকালীন জগতে অবস্থান করে, তাকে শরিয়তের পরিভাষায় ‘বারযাখ’ (برزخ) বলা হয়। 'বারযাখ' শব্দের অর্থ হলো দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী অন্তরায় বা পর্দা। পার্থিব জীবন শেষ হওয়ার সাথে সাথেই প্রতিটি মানুষকে এই বারযাখের জীবনে অর্থাৎ কবরে প্রবেশ করতে হয়, তা তাকে মাটিতে দাফন করা হোক কিংবা অন্য কোনোভাবে তার মৃত্যু হোক। মূলত এটিই হলো মানুষের পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ বা আনুষ্ঠানিক সূচনা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই অন্তর্বর্তীকালীন জীবন সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন: "এবং তাদের সামনে বারযাখ (অন্তরায়) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"
> *(সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত: ১০০)*

অবিশ্বাসীরা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে বলে যে, মারা যাওয়ার পর তো আমরা সে মাটির সাথে পচে গলে মিশে যাবো, তাহলে কিভাবে আমাদের আবার জীবিত করা হবে কিভাবে আমাদের আজাব দেয়া হবে? তখন তাদের কথার জবাবে আল্লাহ বলেন: "মানুষ আমাদের সামনে এক দৃষ্টান্ত পেশ করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, ‘কে জীবিত করবে এই হাড়গুলোকে, যখন তা পচে গলে যাবে?’ বলুন, ‘সেগুলোকে জীবিত করবেন তিনিই, যিনি প্রথমবার সেগুলোর সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত।" সূরা ইয়াসীন (৭৮-৭৯ নং আয়াত): এটি মূলত আমাদের সীমিত জাগতিক বুদ্ধির সীমাবদ্ধতা। যেমন–কোনো মানুষ যখন ঘুমে বিভোর থাকে এবং স্বপ্নে কোনো ভয়াবহ বিপদ দেখে ছটফট করে, তখন পাশে বসে থাকা জীবিত মানুষটি কিন্তু তার সেই শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দেখে না। ঠিক তেমনি, কবরের জীবন হলো আমাদের এই দৃশ্যমান দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগত।

হানি (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হজরত উসমান (রাঃ) কোনো কবরের পাশে দাঁড়ালে এত কাঁদতেন যে তাঁর দাড়ি ভিজে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "জান্নাত ও

জাহান্নামের আলোচনা করা হলে তো আপনি কাঁদেন না, অথচ কবর দেখে কাঁদছেন কেন?"

উত্তরে তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

"নিশ্চয়ই কবর হলো আখিরাতের মনজিলগুলোর মধ্যে প্রথম মনজিল। যদি কেউ এখান থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, তবে তার জন্য পরবর্তী মনজিলগুলো আরও সহজ হয়ে যায়। আর যদি সে এখান থেকে মুক্তি না পায়, তবে তার পরবর্তী মনজিলগুলো আরও কঠিন হয়।"

তিনি (উসমান) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেনঃ আমি কবরের দৃশ্যের চাইতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।

**কবরের সংজ্ঞাঃ

কবর বলতে সাধারণত আমরা বুঝি, মানুষ মৃত্যুর পর সারে তিন হাত মাটি খুরে মৃত ব্যাক্তি কে সেখানে রাখা, ইসলামি পরিভাষায় এই প্রসেস টাকে দাফন বলা হয়, এই নিয়ম বা পদ্ধতি মানব সৃষ্টির শুরু থেকে হয়ে আসছে, এবং আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাঃ) আমাদের শিখিয়ে গেছেন কিভাবে সুন্নত মোতাবেক আমরা সম্মানের সহিত মৃত ব্যাক্তিকে দাফন করবো, আর এটাই দুনিয়ার সর্বোত্তম পন্থা, তবে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য কিছু ধর্মের মানুষেরা মুর্দা বা লাশ কে পুরিয়ে ফেলে, কেউ কেউ কফিন করে রাখে ইত্যাদি, তবে ইসলামই হচ্ছে সর্বোত্তম আদর্শ।

**কবর জীবন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণী ও নির্দেশনা:

কবরের জীবনের বাস্তবতা ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করতে এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য বাণী ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর এই ফরমানগুলো পর্যালোচনা করলে কবরের গুরুত্ব এবং মুমিন জীবনের করণীয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিচে প্রধান কিছু বাণী আলোচনা করা হলো:

১. কবর হলো পরকালের প্রথম প্রবেশদ্বার বা মঞ্জিল:

কবরই হলো মানুষের পরকালীন হিসাব-নিকাশের প্রধান সূচনাবিন্দু। এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

- "নিশ্চয়ই কবর হলো পরকালের প্রথম মঞ্জিল (স্টেশন)। যে ব্যক্তি এখান থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, তার জন্য পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হয়ে যাবে। আর যে এখান থেকে মুক্তি পাবে না, তার জন্য পরবর্তী ধাপগুলো এর চেয়েও কঠিন হবে।" *(সুনানে তিরমিজি, হাদিস নম্বর: ২৩০৮; ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৪২৬৭)*

২. কবর অপেক্ষা ভয়ংকর দৃশ্য আর নেই:

দুনিয়াতে মানুষ অনেক ভয়ংকর পরিস্থিতি বা দৃশ্য দেখে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী অনুযায়ী কবরের ভেতরের দৃশ্যই সবচেয়ে লোমহর্ষক। ওপরের হাদিসটির শেষ অংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও স্পষ্ট করে বলেছেন:

- "আমি কবরের দৃশ্যের চেয়ে অধিক ভয়ংকর বা বীভৎস দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।"

৩. কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ:

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে সবসময় কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন এবং উম্মতকেও প্রতিটি সালাতে তা চাওয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন

সালাতে শেষ তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) শেষ করবে, তখন যেন ৪টি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। তার মধ্যে অন্যতম হলো:

- "আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল কবর..." (অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আজাব থেকে এবং কবরের আজাব থেকে...) *(সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ৫৮৮; সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ১৩৭৭)*

৪. পরকালের স্মরণের উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারতের নির্দেশ:

শুরুর দিকে ইসলামে কবর জিয়ারত নিষেধ থাকলেও পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়াবিমুখতা অর্জন ও আখেরাতকে স্মরণ করার জন্য কবরস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন:

- "আমি পূর্বে তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, (এখন অনুমতি দিচ্ছি) তোমরা কবর জিয়ারত করো। কারণ তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ৯৭৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৩২৩৫)*

৫. কবরের একাকীত্ব ও কেবল আমল সাথে যাওয়ার বাস্তবতা:

মানুষ দুনিয়াতে পরিবার, ধন-সম্পদ ও আভিজাত্য নিয়ে অহংকার করলেও কবরে তাকে একদম একাকী যেতে হয়। এই চিরন্তন সত্যটি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

- "মৃত ব্যক্তির সাথে (কবর পর্যন্ত) তিনটি জিনিস যায়—তার পরিবার, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল (কর্ম)। অতঃপর দুটি জিনিস ফিরে আসে আর একটি জিনিস তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবার ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল বা কর্মটি তার সাথে কবরে থেকে যায়।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ৬৫১৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ২৯৬০)*

**দাফনবিহীন মৃতব্যক্তির বারযাখ ও আজাবঃ

কবরের সংজ্ঞা পড়তে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম যে, সাধারণত কবর বলতে আমরা সারে তিন হাত মাটির ঘরকে বুঝি, তবে ইসলামিক স্কলারদের মতে, কবর মানে শুধু মাটিতে দাফন করা নয়। কেননা, যদি মাটি দেয়াকেই কবর বলা হতো, তাহলে আমাদের যে সব ভাই বোনেরা আগুনে পুরে ছাই হয়ে মারা গেছেন, সাগরে অতল গহীনে ডুবে গেছেন, বা কোন হিংস্র প্রানি যাদের খেয়ে ফেলেছে, তাদের তো কবর দেয়া সম্ভব হয়নি, তাই বলেকি তাদের কবরের জীবন থাকবে না?

উত্তর হলো—অবশই থাকবে। কারন কবরের আজাব, এর সওয়াল-জওয়াব সবাইকেই দিতে হবে। যিনি সাগরে ডুবে মারা গেছেন, তাঁর কবর সাগরেই হবে। যাকে কোন হিংস্র প্রানি খেয়ে ফেলেছে, তাঁর কবর হিসাব নিকাশ সেখানেই হবে। এটা গায়েবের বিষয় মহান আল্লাহর জন্য এটা অত্যন্ত সহজ। তেমনি কেউ আগুনে ছাই হয়ে গেলেও তার কবর হবে, এজন্যই ইসলামিক স্কলাররা বলেন, কবর মানে মাটি নয়; মৃত্যুর পর প্রত্যেক রূহকে আল্লাহ যে (আত্মার) জগতে নিয়া যাওয়া হয়, সেটাই বারজাখ বা কবরের জীবন। তাই মানুষের মৃত্যু যেভাবেই হোক না কেন, সে বারযাখের জগতেই প্রবেশ করে।

**কবরে আজাব থেকে বাঁচার জন্য এক ব্যাক্তির আগুনে ছাই এর ঘটনাঃ

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

“এমন এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনকে বলল, কোন সময় সে কোন ভাল কাজ করেনি। আর এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের ওপর অবিচার করেছে। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে নিজের সন্তান-সন্ততিকে ওয়াসিয়্যাত করল, যখন সে মারা যাবে তাকে যেন পুড়ে ফেলা হয়। অতঃপর মৃতদেহের ছাইভস্মের অর্ধেক স্থলভাগে, আর অর্ধেক সমুদ্রে ছিটিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহর কসম! যদি তিনি (আল্লাহ) তাকে ধরতে পারেন তাহলে এমন শাস্তি দিবেন, যা দুনিয়ার কাউকেও কক্ষনো দেননি। সে মারা গেলে তার সন্তানেরা তার নির্দেশ মতই কাজ করল। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা সমুদ্রকে হুকুম করলেন, সমুদ্র তার মধ্যে যা ছাইভস্ম পড়েছিল সব একত্র করে দিলো। ঠিক এভাবে স্থলভাগকে নির্দেশ করলেন, স্থলভাগ তার মধ্যে যা ছাইভস্ম ছিল সব একত্র করে দিলো। পরিশেষে মহান আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এরূপ কাজ করলে? (উত্তরে বললো) তোমার ভয়ে ’হে রব!’ তুমি তো তা জানো। তার এ কথা শুনে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন” সুবাহানাল্লাহ। (বুখারী ও মুসলিম) [1] সহীহ : বুখারী ৭৫০৬, মুসলিম ২৭৫৬, মুয়াত্ত্বা মালিক ৮২২, সহীহাহ্ ৩০৪৮।

বাতাস যেমন আমরা চোখে দেখি না কিন্তু তার অস্তিত্ব টের পাই, তেমনি মানুষের লাশ পৃথিবীর যেখানেই যেভাবে থাকুক না কেন, আল্লাহর ফেরেশতারা ঠিকই তার আত্মাকে খুঁজে বের করে সওয়াল-জওয়াব ও আজাবের মুখোমুখি করেন। মানুষের প্রযুক্তি যদি হাজার মাইল দূরের স্যাটেলাইট বা মোবাইল নেটওয়ার্ক খুঁজে নিতে পারে, তবে নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহর ফেরেশতাদের জন্য সাগরের তলদেশ বা আগুনের ছাই থেকে আত্মাকে খুঁজে বের করা কোনো ব্যাপারই নয়। সুতরাং, দাফন হোক বা না হোক, পরকালের প্রথম ধাপের এই হিসাব থেকে পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

৩.৫ জান কবজ ও ঊর্ধ্বজগতে রূহের সফরের :

পার্থিব জীবনবের সমাপ্তি এবং পরকালের অনন্ত যাত্রার মধ্যবর্তী সময়টুকুতে প্রতিটি মানুষের রূহ বা আত্মাকে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মতান্ত্রিক ধাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। চোখ বোজার পর থেকে নিয়ে সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে দাফন হওয়া পর্যন্ত এই দৃশ্যমান দুনিয়ায় যখন মৃতদেহের গোসল, কাফন ও জানাজার প্রস্তুতি চলে, তখন অদৃশ্য জগতে (গায়েবে) ওই রূহের সাথে কী কী ঘটে, তা সহীহ হাদিসের আলোকে নিচে ক্রমানুসারে তুলে ধরা হলো:

১. মুমিন,নেককার বান্দার জান কবজ ও রাজকীয় সফর:

যখন কোনো ঈমানদার নেককার বান্দার দুনিয়ার জীবন শেষ হয়ে পরকালের সফর শুরু হয়, তখন আকাশ থেকে অত্যন্ত উজ্জ্বল চেহারার রহমতের ফেরেশতারা নেমে আসেন। তাঁদের চেহারা সূর্যের মতো জকমক করতে থাকে। তাঁদের সাথে থাকে জান্নাতের রেশমি কাফন ও জান্নাতের সুগন্ধি (হানূত)। তাঁরা ওই ব্যক্তির চোখের সীমানা পর্যন্ত দলে দলে বসে পড়েন।

এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা মালাকুল মউত (আজরাইল আ.) এসে তার শিয়রে বসেন এবং অত্যন্ত মৃদু ও স্নেহমাখা স্বরে বলেন—

- *"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো।"*

নবীজি (সা.) বলেন, এই কথা শোনার সাথে সাথে মুমিন বান্দার রূহটি এত সহজে ও শান্তিতে বের হয়ে আসে,"যেমন পানির পাত্র থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে। ফেরেশতারা এক পলকের জন্যও সেই রূহকে মালাকুল মউতের হাতে রাখেন না, বরং তৎক্ষণাৎ জান্নাতের সেই সুগন্ধিযুক্ত কাফনে জড়িয়ে নেন। তখন ওই রূহ থেকে পৃথিবীর বুকে পাওয়া সবচেয়ে চমৎকার কস্তুরীর চেয়েও উত্তম সুঘ্রাণ বের হতে থাকে।

এরপর ফেরেশতারা সেই রূহকে নিয়ে আসমানের দিকে রওনা হন। যাত্রাপথে আকাশের ফেরেশতাদের যে দলের পাশ দিয়েই তাঁরা যান, তাঁরাই সুঘ্রাণ পেয়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, *"এই পবিত্র ও চমৎকার আত্মাটি কার?"* তখন ফেরেশতারা দুনিয়াতে তাকে যে সবচেয়ে সুন্দর ও সম্মানিত নামে ডাকা হতো, সেই নাম ধরে তার পরিচয় দেন।

প্রথম আকাশে পৌঁছানোর পর আসমানের দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করা হলে সাথে সাথে দরজা খুলে দেওয়া হয়। এভাবে প্রতিটি আসমানের সম্মানিত ফেরেশতারা তাকে পরবর্তী আসমান পর্যন্ত এগিয়ে দেন। অবশেষে সপ্তম আকাশে পৌঁছানোর পর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্দেশ দেন—

- "*আমার এই অনুগত বান্দার আমলনামা 'ইল্লিয়্যিন'-এ (উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ নেককারদের খাতায়) লিপিবদ্ধ করো এবং তাকে পুনরায় দুনিয়াতে তার দেহের কাছে (কবরে) ফেরত পাঠাও। কারণ আমি মানুষকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করেছি, মাটিতেই ফিরিয়ে নেব এবং পুনরায় মাটি থেকেই জীবিত করব।*"

কবরের সংকীর্ণতা ও প্রথম চাপ:

দাফন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার ঠিক পর মুহূর্তেই মানুষকে যে প্রথম ভয়াবহ বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়, তা হলো কবরের চাপ। মানুষ ভালো হোক কিংবা মন্দ, মুমিন হোক কিংবা কাফের—কবরের এই প্রাথমিক চাপ বা আলিঙ্গন থেকে পৃথিবীর কোনো মানুষই রেহাই পাবে না।

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.)-এর মৃত্যুর পর ইরশাদ করেছিলেন— (যার মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল এবং যার জানাজায় সত্তর হাজার ফেরেশতা শরিক হয়েছিল):

- "এই সেই ব্যক্তি, যার জন্য আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, যার জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং যার জানাজায় সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত হয়েছিল; তাকেও কবরে একটি চাপ দেওয়া হয়েছে, অতঃপর তার থেকে তা দূর করে দেওয়া হয়।" > *(সহীহ মুসলিম; সুনানে নাসায়ী, হাদিস নম্বর: ২০৫৫; সহীহ আল-জামে: ৪১১৪)*

অন্য একটি হাদিসে আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

- "নিশ্চয়ই কবরের একটি চাপ রয়েছে। যদি এই চাপ থেকে কেউ রক্ষা পেত, তবে সা'দ ইবনে মুআয রক্ষা পেতেন।" *(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নম্বর:*

২৪২৯৪; শুআবুল ঈমান: ৩৯৩)

মুমিন ও কাফেরের জন্য এই চাপের ভিন্নতা:

ইসলামিক স্কলারগণ এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় বলেছেন, কবরের এই চাপটি মূলত দুই ধরনের হয়:

১. **মুমিন বান্দার জন্য:** একজন মায়ের দীর্ঘদিনের নিখোঁজ সন্তান যখন মায়ের কাছে ফিরে আসে, মা যেমন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শক্ত করে চাপ দেন—মুমিনের জন্য কবরের চাপটি হবে ঠিক তেমন স্নেহের ও ভালোবাসার। কবরের মাটি তাকে শক্ত করে চেপে ধরলেও এতে সে কোনো কষ্ট পাবে না, বরং এর পরপরই তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে।

২. **কাফের ও পাপিষ্ঠের জন্য:** অবাধ্য পাপিষ্ঠদের জন্য এই চাপ হবে চরম ক্রোধ ও আজাবের। কবর তাকে এমনভাবে দুই দিক থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে চাপ দেবে যে, তার একদিকের পাঁজর বা বুকের হাড় অন্যদিকের পাঁজরের ভেতর ঢুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। *(সুনানে তিরমিজি, হাদিস: ২৪৬৭)*।

মুমিন ব্যাক্তির সওয়াল-জওয়াব ও শান্তি: কবরের এই চাপের পর মুনকার-নাকির ফেরেশতাদ্বয় এসে হাজির হয় তখন মুমিন ব্যাকটি কে উঠানো হয়, অতপর: তাঁরা ৩ টি প্রশ্ন করেন, তবে কেউ কেউ বলেন ৪ টি প্রশ্ন করা হয় (আল্লাহু আলাম)উ উল্লেখ যোগ্য ৩টি হলো

১.মার রাব্বুকা?

মুমিন ব্যক্তি উত্তর দেবেন: رَبِّيَ اللَّهُ (আমার রব আল্লাহ)।

২.মা দ্বীনুকা?

মুমিন ব্যক্তি উত্তর দেবেন: دِينِيَ الإِسْلاَمُ (আমার ধর্ম ইসলাম)।

৩.মা কুনতা তাকুলু ফি হাযির রাজুল? (তোমাদের নিকট প্রেরিত এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমরা কী বলতে?)

মুমিন ব্যক্তি উত্তর দেবেন: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ (তিনি আল্লাহর রাসূল)। তখন ফেরেশতাদ্বয় তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'আপনি কীভাবে জানলেন?' তখন মুমিন ব্যক্তি বলবেন, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছি, তাঁর ওপর ইমান এনেছি এবং সত্য বলে বিশ্বাস করেছি'

প্রশ্নের উত্তরে সঠিক ঈমানের সাক্ষ্য দেন। এরপর তার কবরকে প্রশস্ত করে দেওয়া হয় এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয়।

২. পাপিষ্ঠ ও অবাধ্য বান্দার জান কবজ ও লাঞ্ছনাকর সফর:

অন্যদিকে, যখন কোনো পাপিষ্ঠ, অবাধ্য বা কাফের মানুষের দুনিয়ার জীবনের সময় শেষ হয়ে আসে এবং পরকালের প্রথম মুহূর্তটি উপস্থিত হয়, তখন আকাশ থেকে অত্যন্ত ভয়ংকর, কুৎসিত ও অন্ধকার চেহারা নিয়ে মৃত্যুর ফেরেশতারা অবতীর্ণ হন। তাঁদের সাথে থাকে জাহান্নামের জঘন্য, দুর্গন্ধযুক্ত এবং মোটা খসখসে কালো চট বা কাফন। কাফেরের রুহ কবজ করার সময় ফেরেশতারা কঠিন ও রুক্ষ ভাষায় তিরস্কার করতে থাকেন এবং আগুন ও উত্তপ্ত পানির আযাবের সংবাদ দিতে থাকেন। এবং তাঁরা ওই পাপিষ্ঠ ব্যক্তির চোখের সীমানা পর্যন্ত ভয়ংকর আকৃতিতে সারিবদ্ধ হয়ে বসে পড়েন।

এরপর মৃত্যুর ফেরেশতা মালাকুল মউত (আজরাইল আ.) এসে তার শিয়রে বসেন এবং অত্যন্ত কঠোর ও কণ্ঠে চিৎকার করে বলেন—

- "হে অপবিত্র ও খবীস আত্মা! আল্লাহর কঠিন ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে আয়।"

নবীজি (সা.) বলেন, মালাকুল মউতের এই ভয়ংকর চিৎকার ও ক্রোধ দেখে ওই রূহটি চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং শরীর থেকে বের না হয়ে শরীরের আনাচে-কানাচে, রগে রগে লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করে। তখন মালাকুল মউত রূহটিকে শরীর থেকে এমন নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে টেনেহিঁচড়ে বের করেন, যেমন বহু কাঁটাযুক্ত লোহার শিক বা শলাকা ভেজা তুলার ভেতর থেকে টেনে বের করা হয়। তুলা থেকে কাঁটাযুক্ত শিক টেনে বের করার সময় যেমন তুলা ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ওই পাপিষ্ঠের রূহ বের করার সময় তার শরীরের ভেতরের রগ, স্নায়ু ও মাংসপেশি ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

যখন মালাকুল মউত রূহটি বের করেন, তখন আজাবের ফেরেশতারা এক পলকের জন্যও তা তাঁর হাতে রাখেন না। তাঁরা তৎক্ষণাৎ রূহটিকে জাহান্নামের সেই দুর্গন্ধযুক্ত কালো চটে জড়িয়ে নেন। তখন ওই রূহ থেকে পৃথিবীর বুকে পাওয়া সবচেয়ে জঘন্য ও পচা লাশের চেয়েও তীব্র দুর্গন্ধ বের হতে থাকে।

এরপর ফেরেশতারা সেই অভিশপ্ত রূহকে নিয়ে আসমানের দিকে রওনা হন। যাত্রাপথে আকাশের ফেরেশতাদের যে দলের পাশ দিয়েই তাঁরা যান, তাঁরাই এই তীব্র দুর্গন্ধ পেয়ে ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং জিজ্ঞেস করেন, *"এই অপবিত্র ও নিকৃষ্ট আত্মাটি কার?"* তখন ফেরেশতারা দুনিয়াতে তাকে যে সবচেয়ে খারাপ, জঘন্য ও লাঞ্ছনাকর নামে ডাকা হতো, সেই নাম ধরে তার আসল পরিচয় দেন।
এরপর যখন প্রথম আকাশে পৌঁছানোর পর আসমানের দরজা খোলার জন্য অনুরোধ করা হয়, তখন তার জন্য আকাশের দরজা খোলা হয় না। রাসূলুল্লাহ (সা.) এই অংশটি বর্ণনা করার সময় পবিত্র কুরআনের এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন:

- *"তাদের জন্য আকাশের দরজাগুলো উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।" > (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত: ৪০)*

অতঃপর মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরশ থেকে নির্দেশ দেন—

- *"তার আমলনামা 'সিজ্জিন'-এ (সর্বনিম্ন ভূগর্ভে অবস্থিত অবাধ্যদের খাতায়) নিক্ষেপ করো। অতঃপর তার রূহকে আসমান থেকে আছাড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দাও।"*

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, এরপর ফেরেশতারা তার রূহকে আসমান থেকে তীব্র অবজ্ঞায় নিচে ছুড়ে ফেলে দেন, যা সরাসরি দুনিয়াতে তার লাশের কাছে অর্থাৎ কবরে এসে পতিত হয়। *(তথ্যসূত্র: মুসনাদে আহমাদ: ১৮৫৩৪, সুনানে আবু দাউদ: ৪৭৫৩, আল-বানি হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন)*

কাফের ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সওয়াল-জওয়াব ও শাস্তি:

দাফন শেষ করে আত্মীয়-স্বজনরা যখন প্রস্থান করে (এমনকি মৃত ব্যক্তি তাদের মধ্যে শেষ কবরস্থান থেকে বের হওয়া ব্যাক্তির জুতার আওয়াজও শুনতে পায়), ঠিক তখনই অত্যন্ত ভয়ংকর আকৃতির দুজন ফেরেশতা কবরে প্রবেশ করেন। তাঁদের নাম 'মুনকার' ও 'নাকির'। হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, তাঁদের গায়ের রঙ অত্যন্ত কুৎসিত কুচকুচে কালো, চোখ দুটি নীল আগুনের মতো দাউদাউ করে জ্বলছে, কণ্ঠস্বর মেঘের গর্জনের মতো ভয়ংকর এবং তাঁদের চুলগুলো মাটি পর্যন্ত ছেঁচড়ে চলছে। তাঁদের হাতে থাকে বিশাল এক লোহার হাতুড়ি, যা দিয়ে যদি পৃথিবীর কোনো পাহাড়ের ওপর আঘাত করা হয়, তবে পুরো পাহাড় ধুলা ও ছাইতে পরিণত হয়ে যাবে। তাঁরা

এসে মৃত ব্যক্তিকে অত্যন্ত কর্কশ ও ধমকের সুরে সোজা করে বসিয়ে দেন এবং জেরা শুরু করেন। *(তথ্যসূত্র: সুনানে তিরমিজি, হাদিস নম্বর: ১০৭১য়*
ফেরেশতাদ্বয় অত্যন্ত কঠোর ও ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কাফের বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকে পর পর তিনটি প্রশ্ন করেন:

প্রথম প্রশ্ন: *'মার রাব্বুকা?'* (তোমার রব বা প্রতিপালক কে?) কাফের ব্যক্তি চরম আতঙ্কিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলবে— *"হা, হা, লা আদরী!"* (হায়! আফসোস! আমি তো জানি না!)। দুনিয়াতে সে মুখে আল্লাহর নাম নিলেও মনে বিশ্বাস করত না বা আল্লাহর বিধান মানত না, তাই কবরে তার মুখ দিয়ে সঠিক উত্তর বের হবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন: *'মা দ্বীনুকা?'* (তোমার দ্বীন বা ধর্ম কী ছিল?) সে একই উপায়ে হাহাকার করে বলবে— *"হা, হা, লা আদরী!"* (হায়! আফসোস! আমি জানি না!)।

তৃতীয় প্রশ্ন: *মা কুনতা তাকুলু ফী হাযার রাজুল?'* (এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি দুনিয়াতে কী বলতে বা কী ধারণা পোষণ করতে?) কাফের ও মুনাফিক ব্যক্তি বলবে— *"হায়! আমি তো জানি না! আমি মানুষকে যা বলতে শুনতাম, তা-ই বলতাম (নিজের কোনো ঈমান ছিল না)।" (তথ্যসূত্র: সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ১৩৭৪)*
যখন সে তিনটি প্রশ্নের একটিরও উত্তর দিতে পারবে না, তখন আসমান থেকে এক অদৃশ্য ঘোষক (আল্লাহ তাআলা) ঘোষণা করবেন:

- *"সে মিথ্যা বলেছে! সুতরাং তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিছানা বিছিয়ে দাও, তাকে জাহান্নামের আগুনের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার কবরের সাথে জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও।"*

তখন সাথে সাথে তার কবর থেকে জাহান্নাম পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ বা দরজা খুলে দেওয়া হবে, যেখান থেকে জাহান্নামের প্রচণ্ড উত্তপ্ত লূ-হাওয়া, বিষাক্ত গরম বাতাস এবং আগুনের শিখা অনবরত তার কবরে আসতে থাকবে।

পাপিষ্ঠ ব্যক্তির কবরের চাপ ও হাতুড়ির আঘাত:
এর পরপরই কবরকে নির্দেশ দেওয়া হবে তাকে চেপে ধরার জন্য। কবর তাকে এমনভাবে দুই দিক থেকে পিষে ফেলবে যে, তার একদিকের পাঁজর অন্যদিকের

পাঁজরের ভেতর ঢুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর সেই অন্ধ ও বধির ফেরেশতাকে তার ওপর আজাবের জন্য নিযুক্ত করা হবে। সেই ফেরেশতা ওই বিশাল লোহার হাতুড়ি দিয়ে কাফের ব্যক্তির দুই চোখের মাঝখানে প্রচণ্ড শক্তিতে আঘাত করতে থাকবেন। প্রতিটি আঘাতের সাথে সাথে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এমন কলিজা ফাটানো চিৎকার ও আর্তনাদ করতে থাকবে, যা মানুষ ও জিন ছাড়া পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তের সমস্ত সৃষ্টি জীব শুনতে পাবে। আঘাতের চোটে সে মাটিতে মিশে ছাই হয়ে যাবে, আল্লাহ আবার তাকে আগের মতো করবেন এবং ফেরেশতা আবার তাকে আঘাত করতে থাকবেন। কিয়ামত পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অবিরত চলতে থাকবে। *(তথ্যসূত্র: সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নম্বর: ৪৭৫৩)*

"কবরের এই আজাব কেবল আত্মিক নয়, বরং এটি একই সাথে শারীরিক ও মানসিক। কাফের ব্যক্তিটি যখন দেখে যে দুনিয়ার কোনো শক্তি, ক্ষমতা বা অর্থ তাকে এই ভয়ংকর ফেরেশতাদের হাত থেকে বাঁচাতে পারছে না, তখন তার ভেতরের আফসোস ও মানসিক যন্ত্রণা শারীরিক আজাবের চেয়েও কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এটিই হলো অবাধ্যতার প্রথম নগদ ও ভয়ংকর পরকালীন শাস্তি।"

কবরের আজাবের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা (স্থায়ী বনাম সাময়িক আজাব):

কবরের সওয়াল-জওয়াব এবং প্রাথমিক আজাব শুরু হওয়ার পর, এই আজাব কিয়ামত পর্যন্ত কীভাবে চলবে—এই বিষয়ে ইসলামি আকীদা ও সহীহ হাদিসের আলোকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। কবরের আজাব বা শান্তি সবার জন্য এক নাগাড়ে সমানভাবে চলে না, বরং এটি মানুষের ঈমান ও আমলের ওপর ভিত্তি করে দুই ভাগে বিভক্ত:

১. কাফের, মুশরিক এবং মুনাফিকদের জন্য (স্থায়ী ও অবিরত আজাব):

যাঁরা দুনিয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে (কাফের) কিংবা মুখে ইসলামের কথা বললেও অন্তরে কুফরি লালন করেছে (মুনাফিক), তাঁদের জন্য কবরের আজাব কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এক সেকেন্ডের জন্যও বন্ধ হবে না। তাঁদের জন্য কোনো "ঘুম" বা বিশ্রামের সুযোগ নেই।

সহীহ বুখারীর সেই বিখ্যাত দীর্ঘ হাদিসে (যেখানে নবীজি সা.-কে ফেরেশতারা আজাবের দৃশ্য দেখিয়েছিলেন) প্রতিটি অপরাধের শাস্তির শেষে বলা হয়েছে:

- "তার সাথে কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত এই আচরণই করা হতে থাকবে।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ৭০৪৭)*

অর্থাৎ, কাফেরদের ক্ষেত্রে লোহার হাতুড়ির আঘাত, সাপের দংশন কিংবা জাহান্নামের আগুনের লূ-হাওয়া কিয়ামতের দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অবিরত ও বিরতিহীনভাবে চলতে থাকবে।

২. গুনাহগার মুমিনদের জন্য (সাময়িক বা বিরতিসম্পন্ন আজাব):

যাঁরা মূলত ঈমানদার ছিলেন কিন্তু দুনিয়াতে কিছু কবিরা গুনাহ বা পাপাচারের লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের কবরের আজাব স্থায়ী নাও হতে পারে। ওলামায়ে কেরামদের মতে, গুনাহগার মুমিনদের আজাব দুই উপায়ে বন্ধ বা হালকা হতে পারে:

- ক. আজাব ভোগ করার মাধ্যমে গুনাহ শেষ হওয়া: একজন মুমিন তার পাপের সমপরিমাণ আজাব কবরে ভোগ করার পর এক সময় তার আজাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এরপর সে কিয়ামত পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে।
- খ. জীবিতদের দুআ বা সদকায়ে জারিয়ার মাধ্যমে: দুনিয়াতে থাকা জীবিত কোনো মানুষের ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), জানাজার সালাত, সন্তানের নেক

দুআ কিংবা মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া কোনো ভালো কাজের (সদকায়ে জারিয়া) উসিলায় আল্লাহ তাআলা দয়া করে যেকোনো মুহূর্তে ওই মুমিনের কবরের আজাব চিরতরে বন্ধ করে দিতে পারেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন চোগলখোর ও প্রস্রাবের পবিত্রতা না নেওয়া দুই ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি একটি খেজুরের তাজা ডাল দুই টুকরো করে দুই কবরে গেড়ে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন:

- "আশা করা যায়, এই ডাল দুটি শুকানো পর্যন্ত তাদের আজাব কিছুটা হালকা করা হবে।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ২১৬)*

এই হাদিসটি প্রমাণ করে যে, গুনাহগার মুমিনদের আজাব আল্লাহর ইচ্ছায় সাময়িক হতে পারে এবং তা হ্রাস বা বন্ধ হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

তাহলে শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার সময় "সবাই জাগ্রত হবে" ও "ঘুমের" কথাটার ব্যাখ্যা কী?

পবিত্র কুরআনের সূরা ইয়াছিনের ৫২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন কাফেররা কবর থেকে ওঠার সময় বলবে:

- "তারা বলবে, ‘হায় আফসোস আমাদের! কে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে পুনরুত্থিত করল?’"

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ (যেমন ইমাম ইবনে কাছীর রহ.) বলেন: কাফেররা কবরে যে ভয়াবহ আজাব ভোগ করছিল, কিয়ামত শুরু হওয়ার পর হাশরের ময়দানের শাস্তি এবং জাহান্নামের আগুন দেখে তারা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়বে যে, হাশরের ময়দানের সেই কঠিন আজাবের তুলনায় কবরের ভয়াবহ আজাবটিকেও তাদের কাছে "হালকা ঘুম বা আরামের জায়গা" মনে হবে! এছাড়া কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী, প্রথমবার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়ার পর (যখন পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে) থেকে শুরু করে দ্বিতীয়বার ফুঁক দেওয়ার (যখন সবাই জীবিত হবে) মধ্যবর্তী সময়ে কবরের আজাব কিছুটা স্তিমিত থাকে।

সারকথা হলো: কাফের ও মুনাফিকদের জন্য কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আজাব অবিরত চলতে থাকবে, তাদের জন্য শান্তির কোনো ঘুম নেই। আর গুনাহগার মুমিনদের আজাব আল্লাহর দয়ায় বা শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা

কিয়ামত পর্যন্ত শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকে। (আল্লাহু আলাম)

কবর জীবন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর গুরুত্বপূর্ণ বাণী ও নির্দেশনা

কবরের জীবনের বাস্তবতা ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করতে এবং পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় অসংখ্য বাণী ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। আল্লাহর রাসূল (সা.)-এর এই ফরমানগুলো পর্যালোচনা করলে কবরের গুরুত্ব এবং মুমিন জীবনের করণীয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিচে প্রধান কিছু বাণী আলোচনা করা হলো:

১. কবর হলো পরকালের প্রথম প্রবেশদ্বার বা মঞ্জিল:

কবরই হলো মানুষের পরকালীন হিসাব-নিকাশের প্রধান সূচনাবিন্দু। এ প্রসঙ্গে হযরত উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

- "নিশ্চয়ই কবর হলো পরকালের প্রথম মঞ্জিল (স্টেশন)। যে ব্যক্তি এখান থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, তার জন্য পরবর্তী ধাপগুলো সহজ হয়ে যাবে। আর যে এখান থেকে মুক্তি পাবে না, তার জন্য পরবর্তী ধাপগুলো এর চেয়েও কঠিন হবে।" *(সুনানে তিরমিজি, হাদিস নম্বর: ২৩০৮; ইবনে মাজাহ, হাদিস: ৪২৬৭)*

২. কবর অপেক্ষা ভয়ংকর দৃশ্য আর নেই:

দুনিয়াতে মানুষ অনেক ভয়ংকর পরিস্থিতি বা দৃশ্য দেখে, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী অনুযায়ী কবরের ভেতরের দৃশ্যই সবচেয়ে লোমহর্ষক। ওপরের হাদিসটির শেষ অংশে রাসূলুল্লাহ (সা.) আরও স্পষ্ট করে বলেছেন:

"আমি কবরের দৃশ্যের চেয়ে অধিক ভয়ংকর বা বীভৎস দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।"

৩. কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ:

রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে সবসময় কবরের আজাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতেন এবং উম্মতকেও প্রতিটি সালাতে তা চাওয়ার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন সালাতে শেষ তাশাহহুদ (আত্তাহিয়্যাতু) শেষ করবে, তখন যেন ৪টি জিনিস থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। তার মধ্যে অন্যতম হলো:

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম, ওয়া মিন আযাবিল কবর..."

(অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি জাহান্নামের আজাব থেকে এবং

কবরের আজাব থেকে...) *(সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ৫৮৮; সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ১৩৭৭)*

৪. পরকালের স্মরণের উদ্দেশ্যে কবর জিয়ারতের নির্দেশ:

শুরুর দিকে ইসলামে কবর জিয়ারত নিষেধ থাকলেও পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ (সা.) দুনিয়াবিমুখতা অর্জন ও আখেরাতকে স্মরণ করার জন্য কবরস্থানে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন:

- "আমি পূর্বে তোমাদের কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, (এখন অনুমতি দিচ্ছি) তোমরা কবর জিয়ারত করো। কারণ তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ৯৭৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৩২৩৫)*

৫. কবরের একাকীত্ব ও কেবল আমল সাথে যাওয়ার বাস্তবতা:

মানুষ দুনিয়াতে পরিবার, ধন-সম্পদ ও আভিজাত্য নিয়ে অহংকার করলেও কবরে তাকে একদম একাকী যেতে হয়। এই চিরন্তন সত্যটি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন:

- "মৃত ব্যক্তির সাথে (কবর পর্যন্ত) তিনটি জিনিস যায়—তার পরিবার, তার ধন-সম্পদ এবং তার আমল (কর্ম)। অতঃপর দুটি জিনিস ফিরে আসে আর একটি জিনিস তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবার ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে, আর তার আমল বা কর্মটি তার সাথে কবরে থেকে যায়।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ৬৫১৪; সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ২৯৬০)*

কবরের আজাব হতে মুক্তি লাভের সুনির্দিষ্ট আমল ও উপায় (বিস্তারিত সংস্করণ)

কবরের আজাবের ভয়াবহতা যেমন অকাট্য, তেমনি মহান আল্লাহর অসীম দয়ায় এই আজাব থেকে বেঁচে থাকার এবং কবরকে জান্নাতের টুকরো বানিয়ে নেওয়ার সুনির্দিষ্ট কিছু আমল ও সৌভাগ্যের কথা রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের শিখিয়ে গেছেন। ইসলামের মহান ইমাম ও আলেমগণ—যেমন **ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওজিয়্যাহ (রহ.) তাঁর বিখ্যাত 'কিতাবুর রূহ' (كتاب الروح)-এ** এবং **ইমাম ইবনে রযব হানবালী (রহ.) তাঁর 'আহওয়ালুল কুবূর' (أهوال القبور)-এ** কবরের আজাব থেকে মুক্তির

উপায়গুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করেছেন: **ক. সাধারণ বা মৌলিক উপায়** এবং **খ. সুনির্দিষ্ট কিছু আমল ও বিশেষ অবস্থা**।
কোরআন ও সহীহ হাদিসের আলোকে এই মুক্তি লাভের মাধ্যমগুলো নিচে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো:

রাতে নিয়মিত সূরা আল-মুলক তিলাওয়াত ও তা অনুধাবন করা:
কবরের আজাব প্রতিরোধকারী হিসেবে এই সূরাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা আলবানী (রহ.) তাঁর 'সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব'-এ এই সংক্রান্ত হাদিসগুলো এনেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

- "যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা আল-মুলক পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা এর বরকতে তাকে কবরের আজাব থেকে রক্ষা করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে আমরা এই সূরাটিকে 'আল-মানিআহ' (المانعة) বা 'প্রতিরোধকারী সূরা' বলে ডাকতাম।" > *(সুনানে নাসায়ী, সুনানে তিরমিজি; আলবানী হাদিসটিকে সহীহ বলেছেন)*

ইমাম ইবনে রযব হানবালী (রহ.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই সূরাটি কেবল মুখে পড়ার মধ্যেই মুক্তি সীমাবদ্ধ নয়, বরং সূরার ভেতরের তাওহীদ ও পরকালের বার্তা যে ব্যক্তি নিজের জীবনে লালন করবে, এই সূরাটি তার কবরের চারপাশে একটি নূরের প্রাচীর তৈরি করবে।

ইমাম ইবনে কায়্যিম (রহ.) বলেন,
কবরের আজাব থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় সাধারণ উপায় হলো— মানুষ ঘুমানোর আগে প্রতিদিন কিছু সময় একা বসবে। অতপর সে নিজের নফসের হিসাব নেবে যে, আজকের সারাদিনে সে আল্লাহর কী কী হক নষ্ট করেছে এবং মানুষের কী কী ক্ষতি করেছে। এরপর সে খাঁটি মনে আল্লাহর কাছে তাওবা করবে এবং এই নিয়ত নিয়ে ঘুমাবে যে, যদি সে আগামীকাল জীবিত হয়, তবে আর কোনো গুনাহ করবে না। প্রতি রাতে এই আমলকারী ব্যক্তি কবরের আজাব থেকে সুরক্ষিত থাকবে।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা এই তাওবা ও ঈমানের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়ে এরশাদ করেছেন:

- "নিশ্চয়ই যারা বলে, ‘আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ’, তারপর অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), ‘তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার সুসংবাদ নাও।’" > *(সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৩০)*

হযরত ইবনে মাসুদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন সূরা মুলক তিলাওাতকারীকে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ রাখা হবে, যখন কবরের শাস্তি ঐ ব্যাক্তির মাথার নিকট আসবে তখন সূরা মূলক বাঁধা দিবে এবং বলবে, তুমি এই ব্যাক্তির নিকট থেকে চলে যাও; কেননা সে আমাকে সর্বদা তিলাওাত করতো। আর যখন শাস্তি পায়ের নিকট এসে হাজির হবে তখন সে বাঁধা দিয়ে বলবে, তুমি চলে যাও। কেননা, সে আমাকে দন্ডায়মান হয়ে তিলাওাত
করতো।
(বায়হাক্বী)

সহীহ হাদিসের আলোকে কবরের আজাবের সুনির্দিষ্ট কারণসমূহ

ইসলামি শরিয়ত ও আকীদার আলোকে এটি প্রমাণিত যে, কবরের আজাব অবধারিত এবং তা মানুষের দুনিয়াবী পাপাচার ও অবাধ্যতার কারণেই হয়ে থাকে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিভিন্ন হাদিসে বিশেষ কিছু গুনা বা অপরাধের কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর কারণে মানুষ কবরের কঠিন আজাবে লিপ্ত হয়। বর্তমান যুগের সামাজিক অবক্ষয় ও মানুষের চারিত্রিক ত্রুটিগুলোর সাথে এই কারণগুলোর গভীর সংযোগ রয়েছে। নিচে সেই সুনির্দিষ্ট কারণসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

প্রস্রাবের পর পবিত্রতা অর্জনে অসতর্কতা থাকার কারনে

দৈনন্দিন জীবনের অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু পরকালীন জীবনের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক একটি ভুল হলো প্রস্রাব করার পর ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন না করা কিংবা প্রস্রাবের সূক্ষ্ম ছিটা থেকে শরীর ও কাপড়কে রক্ষা না করা। কবরের আজাবের যতগুলো কারণ হাদিসে এসেছে, তার মধ্যে এটিকে অন্যতম প্রধান এবং প্রথম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ছাগল চরানোর সেই ঐতিহাসিক সহীহ হাদিস: হযরত আবূ উমামাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার (মদীনার) জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে থাকা সাহাবীগণও দাঁড়িয়ে গেলেন। নবীজি (সা.) দুটি কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, *"এখানে এই দুই ব্যক্তিকে দাফন করা হয়েছে কি?"* সাহাবীগণ বললেন, "হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল!" তখন নবীজি (সা.) বললেন:

"এই দুই ব্যক্তিকে এখন তাদের কবরে কঠিন আজাব দেওয়া হচ্ছে। তাদের একজন তো এমন ছিল যে, সে দুনিয়াতে ছাগল চরাত (অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে: সে রাখাল ছিল)। ছাগল চরানোর সময় বা প্রস্রাব করার সময় সে প্রস্রাবের ছিটা থেকে নিজের শরীর ও কাপড়কে বাঁচাত না, অপবিত্রতা নিয়েই ঘুরে বেড়াত এবং এই অসতর্কতার কারণেই আজ তাকে কবরে পিষে ফেলা হচ্ছে।" > *(উৎস: মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নম্বর: ২২৩১৬; ইমাম আলবানী এই হাদিসের সনদকে 'সহীহ' বা বিশুদ্ধ বলেছেন)*

প্রস্রাবের আজাব সম্পর্কিত আরও কিছু অকাট্য দলিল: হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতকে কঠোর সতর্কবার্তা দিয়ে ইরশাদ করেছেন:

- "তোমরা প্রস্রাবের ছিটা থেকে খুব ভালোভাবে বেঁচে থাকো (পবিত্রতা অবলম্বন করো)। কারণ, কবরের অধিকাংশ আজাবই সাধারণত প্রস্রাবের অপবিত্রতার কারণে হয়ে থাকে।" *(উৎস: সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নম্বর: ৩৪৮; মুসনাদে আহমাদ: ২/৩২৬; ইমাম হাকেম একে সহীহ বলেছেন)*

ইসলামের বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ—যেমন **ইমাপ হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) তাঁর 'ফাতহুল বারী' (فتح الباري)** কিতাবে এই হাদিসগুলোর ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

- **পাপটি কেন এত বড়:** প্রস্রাবের ছিটা থেকে বেঁচে না থাকাটা বাহ্যিকভাবে মানুষের কাছে খুব ছোট বা সাধারণ মনে হলেও, এটি মূলত একটি চেইন বা ধারাবাহিক গুনাহের জন্ম দেয়। কাপড় বা শরীর অপবিত্র থাকলে মানুষের সালাত (নামাজ) কবুল হয় না। আর নামাজ কবুল না হলে বান্দার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায়।
- **ছাগল চরানোর ঘটনার শিক্ষা:** ছাগল বা পশুর প্রস্রাবের ছিটা শরীরে লাগলে অনেকে মনে করে "এটা তো পশুর হিসু, সমস্যা নেই" বা অলসতাবশত ধুয়ে ফেলে না। কিন্তু শরিয়তের বিধান অনুযায়ী, যে পশুর মাংস খাওয়া হালাল, তার পেশাব-পায়খানার পবিত্রতার ব্যাপারেও ফকীহদের কড়া নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষ করে রাখাল বা পশু পালনকারীদের ক্ষেত্রে এই অসতর্কতা বেশি দেখা যায় বলেই নবীজি (সা.) এই সুনির্দিষ্ট ঘটনার মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত উম্মতকে সতর্ক করে গেছেন।
- **আধুনিক যুগের প্রেক্ষাপট:** বর্তমান যুগে হাই-কমোড বা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার যে কালচার তৈরি হয়েছে, তাতে শরীর ও কাপড়ে প্রস্রাবের অলক্ষ্য ছিটা লাগার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে গেছে। এই আধুনিক উদাসীনতা মানুষকে অজান্তেই কবরের আজাবের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন করে তা আমল না করা এবং ফরজ সালাতে অলসতার কারনে কবরের আজাব

সহীহ বুখারীর একটি দীর্ঘ হাদিসে (স্বপ্ন সংক্রান্ত হাদিস) রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে ফেরেশতারা কবরের আজাবের কিছু দৃশ্য সশরীরে দেখিয়েছিলেন। নবীজি (সা.) বলেন, আমি দেখলাম এক ব্যক্তি শুয়ে আছে এবং আরেকজন বিশাল পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে ওই পাথর দিয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করছে এবং মাথাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। পাথরটি গড়িয়ে দূরে চলে যাচ্ছে, সে পাথরটি কুড়িয়ে আনার মাঝেই মাথাটি আবার আগের মতো সুস্থ হয়ে যাচ্ছে এবং ফেরেশতা আবার আঘাত করছে। নবীজি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে?" ফেরেশতারা উত্তর দিলেন:
"এ হলো ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের জ্ঞান দান করেছিলেন কিন্তু সে রাতে কুরআন ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকত (আমল করত না) এবং ফরজ সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিত।" *(সহীহ বুখারী, হাদিস নম্বর: ৭০৪৭)*

মিথ্যাচার এবং অপপ্রচার (মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে দেওয়া):

একই দীর্ঘ হাদিসে নবীজি (সা.) আজাবের আরেকটি দৃশ্য বর্ণনা করে বলেন— আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে চিত হয়ে শুয়ে আছে এবং আরেকজন লোহার আঁকড়া বা শলাকা নিয়ে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে ওই লোহার আঁকড়া দিয়ে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মুখের একপাশ থেকে শুরু করে চোয়াল, নাক ও চোখ চিরে মাথার পেছন দিক পর্যন্ত টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। এরপর অন্যপাশে একই আচরণ করছে। একপাশ শেষ হতে না হতেই অন্যপাশ জোড়া লেগে যাচ্ছে এবং এই শাস্তি অবিরত চলছে। ফেরেশতারা এর কারণ হিসেবে বলেন:

- "এই ব্যক্তি সকালবেলা নিজের ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা কথা বলত বা অপপ্রচার করত, যা মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর চারদিকে (দিগদিগন্তে) ছড়িয়ে পড়ত।"

বর্তমান যুগের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (Social Media)-এর যুগে এই হাদিসটির বাস্তবতা সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়, যেখানে একটি মিথ্যা গুজব বা ফেক নিউজ মুহূর্তের মধ্যে কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

ব্যভিচার (যিনা) এবং অনৈতিক সম্পর্ক এর কারনে কবরের আজাব

নবীজি (সা.) বলেন, সফরের এক পর্যায়ে আমি তন্দুর বা চুল্লির মতো একটি গর্তের কাছে গেলাম, যার ওপরের অংশ সংকীর্ণ এবং ভেতরের অংশ বেশ প্রশস্ত। তার ভেতর থেকে তীব্র চিৎকার ও শোরগোল আসছিল। আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম, তার ভেতরে বহু উলঙ্গ নারী-পুরুষ চিৎকার করছে। নিচ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা আসার সাথে সাথেই তারা তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে ওপরে উঠে আসছে, আবার আগুন কমে গেলে নিচে নেমে যাচ্ছে। ফেরেশতারা বললেন:

- "এরা হলো দুনিয়ার ওই সমস্ত নারী ও পুরুষ, যারা অবৈধ ব্যভিচার বা যিনায় লিপ্ত ছিল।"

সুদ খাওয়া ও সুদী কারবারের সাথে জড়িত থাকার কারনে কবরের আজাব

নবীজি (সা.) তাঁর সেই অলৌকিক সফরে রক্তের একটি নদী দেখতে পান, যার মাঝখানে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছিল এবং তীরের ওপর পাথর নিয়ে আরেকজন দাঁড়িয়ে ছিল। সাঁতার কাটতে কাটতে ব্যক্তিটি যখনই তীরের দিকে আসতে চাইত, তীরে দাঁড়ানো ব্যক্তিটি তার মুখ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড শক্তিতে পাথর ছুড়ে মারত। পাথরের আঘাতে সে আবার নদীর মাঝখানে রক্ত ও আগুনের স্রোতে ভেসে যেত। ফেরেশতারা জানান:

"নদীতে সাঁতার কাটা এই ব্যক্তিটি হলো দুনিয়ার সুদখোর।"

সে দুনিয়াতে হালাল হারাম মেনে চলতো না, সুদের উপর ব্যবসা করতো, তাই আজকে তাঁর এই অবস্থা

"ওপরের এই সুনির্দিষ্ট কারণগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কবরের আজাবের সিংহভাগ কারণই মানুষের হাক্কুল ইবাদ বা বান্দার হকের সাথে জড়িত। গীবত করা, মিথ্যা অপপ্রচার, ব্যভিচার কিংবা সুদের মতো অপরাধগুলো সরাসরি সমাজ ও অন্য মানুষের অধিকার হরণ করে। ইসলামে আধ্যাত্মিক পবিত্রতার পাশাপাশি সামাজিক সততা ও নৈতিকতার গুরুত্ব কতখানি, কবরের এই আজাবের কারণগুলো তারই অকাট্য প্রমাণ।"

এক নজরে কবরের আজাব হতে মুক্তি এবং পরকালীন প্রস্তুতির বাস্তব রূপরেখা

অপরাধ বা আজাবের সুনির্দিষ্ট কারণ	অপরাধের ধরণ ও সামাজিক প্রভাব	মুক্তির সুনির্দিষ্ট আমল ও প্রতিষেধক	সহীহ হাদিস ও কিতাবের রেফারেন্স
১.প্রস্রাবের ছিটা ও অপবিত্রতা	ব্যক্তিগত অসতর্কতা, যার কারণে সালাত কবুল হয় না।	সঠিক নিয়মে পবিত্রতা (তাহারাত) অর্জন করা।	মুসনাদে আহমাদ: ২২৩১৬, ইবনে মাজাহ: ৩৪৮
২.চোগলখোরী ও গীবত	সমাজ ও মানুষের মাঝে ফাসাদ বা বিভেদ সৃষ্টি করা।	জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা, মানুষের গীবত বন্ধ করা।	সহীহ বুখারী: ২১৬, কিতাবুর রূহ

৩.কুরআন অমান্য ও সালাতে অলসতা	**আল্লাহর হুকুমের অবাধ্যতা এবং ফজর নামাজ ত্যাগ।**	**নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও ৫ ওয়াক্ত সালাত কায়েম।**	**সহীহ বুখারী: ৭০৪৭, আহওয়ালুল কুবূর**
৪.মিথ্যাচার ও গুজব অপপ্রচার	**অসত্য সংবাদ ছড়ানো,যা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি করে।**	**সর্বদা সত্য কথা বলা এবং তথ্য যাচাই করা।**	**সহীহ বুখারী: ৭০৪৭**
৫. সুদ ও সুদী কারবার	**অর্থনৈতিক জুলুম এবং গরীবের রক্ত চোষা।**	**হালাল ব্যবসা প্রসার ও সুদী লেনদেন বর্জন।**	**সহীহ বুখারী: ৭০৪৭, আত-তাযকিরাহ**

উপসংহারঃ

পুরো থিসিস থেকে আমরা এটাই বুঝলাম যে, কবরের আজাব কোনো গল্প-কথা বা কাল্পনিক বিষয় নয়। এটা পরকালের একদম প্রথম বাস্তব স্টেশন, যেখান দিয়ে আমাদের প্রত্যেককে যেতেই হবে। দুনিয়ার টাকা-পয়সা, ক্ষমতা বা বড় বংশের পরিচয়—কোনো কিছুই সাড়ে তিন হাত মাটির অন্ধকার কবরে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। সেখানে আমাদের একমাত্র আসল বন্ধু হবে আল্লাহর ওপর খাঁটি বিশ্বাস আর আমাদের ভালো কাজগুলো।

বিশেষ করে প্রস্রাবের পর ভালোমতো পবিত্র হওয়া, মানুষের পেছনে গীবত বা চোগলখোরী না করা এবং সমাজ নষ্ট করে এমন মিথ্যা কথা বা গুজব ছড়ানো থেকে দূরে থাকা কবর জীবনের জন্য খুবই জরুরি। আর সবচেয়ে সুন্দর বিষয় হলো, কবরের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমাদের সংসার বা দুনিয়াদারী ছেড়ে দিতে হবে না। আমরা যদি আমাদের প্রতিদিনের সাধারণ কাজগুলো—যেমন নিয়ত ঠিক রেখে সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, পরিবারের দেখাশোনা করা, পড়ালেখা করা বা

রান্নাবান্নার মতো কাজগুলোও আল্লাহর হুকুম আর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দেখানো নিয়মে করি, তবে আমাদের এই সমস্ত দৈনন্দিন কাজই ইবাদতে রূপান্তর হয়ে যাবে। আর এই ছোট ছোট অভ্যাসগুলোই আমাদের কবরের অন্ধকার দূর করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হবে।

মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সময় থাকতে থাকতেই কবরের প্রস্তুতি নেওয়ার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের মধ্যে থেকে যারা ইতিমধ্যে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবর জীবনে প্রবেশ করেছেন তাদের কবরগুলোকে সুন্দর ও শান্তিময় বানিয়ে দিন। আমীন।

১. কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ ..

২. আর রূহ: ইমাম ইবনু কায়্যিমিল জাওযিয়্যাহ (রহ.)

৩. কবরের প্রথম রাত শাহ সূফী আলম ফকরী

৪. জীবনের আসল উদ্দেশের খোজে -মুহাম্মাদ নুরে আলম

৫. জিজ্ঞাসা ও জবাব -আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর

৬.কোরআন ও হাদিসের আলোকে চোখে দেখা কবরের আজাব - হযরত মাওলানা তারিক জামিল